OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 184 - 189
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 184 - 189
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 – 0848

দ্রৌপদী : মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে এক প্রতিবাদী নারী

ড. শিপ্রা দত্ত (ঘোষ)
সহযোগী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ
মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ, আগরতলা, ত্রিপুরা
Email ID: sipradg70@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Society, backward, simple, superstition, expose, rebellious, hypocritical.

Abstract
Mahasweta Devi in her novel presents the true picture of the happiness and sorrows of backward people of the society in front of the reader. In her short stories also, she reveals the stories of those who are completely separated from the mainstream urban population.

They don't demand luxury things or travelling to distant places like so-called civilized people. Their life is very simple, they want simple food to replenish their hunger. Mahasweta Devi wrote many novels and short stories explaining the problems of helpless, destitute and weak people to the common mass who are unaware off. She not only conveys the reader about their problems but also played a pivotal role by solving their problems. Most of the stories written by Mahasweta Devi is based on tribal life who are devoid of their fundamental rights. A selfish class of people has been purposefully depriving the tribals day after day by taking advantage of their weakness on the pretext of various superstitions and myths. Mahasweta Devi's sole aim was to expose the real face of those hypocritical deceivers. It will become clearer to us if we discuss the story of 'Draupadi'.

Discussion

'দ্রৌপদী' (১৯৭৬) নকশাল আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত মহাশ্বেতা দেবীর একটি বিখ্যাত গল্প। এই গল্পে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মেয়ে দ্রৌপদীকে লেখিকা প্রতিবাদী চরিত্র রূপে অঙ্কন করেছেন। 'মহাভারত' এ দ্রৌপদী যেমন রাজসভায় অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েও অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে ভারতীয় সাহিত্যে এক অসাধারণ প্রতিবাদী চরিত্ররূপে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। মহাশ্বেতা দেবী তেমনি এক আদিবাসী রমণীকে 'মহাভারত' এর এক অসামান্যা নারী দ্রৌপদীর মতোই অসাধারণ রূপে অঙ্কিত করেছেন। কারণ মহাভারতের দ্রৌপদীও ধর্ষিত হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীম দুঃশাসনের উরু ভঙ্গ করে তার অপকর্মের শাস্তি দেয়। এই 'দ্রৌপদী' গল্পে সেই কৃষ্ণ অনুপস্থিত যিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন। তাই দ্রৌপদী তার উপর ধর্ষণের প্রতিবাদ সে নিজেই করে। সে নিজেকে নগ্ন করে সমস্ত রকমের বীরত্ব এবং বিক্রমের বর্ম খুলে পরে। দ্রৌপদী চরিত্রটি বহুদিনের জমে থাকা অত্যাচার উৎপীড়নের এক জ্বলন্ত বহিঃপ্রকাশ। দৌপদীর প্রতিবাদ যেন আমাদের পুরো নারী সমাজের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ। যারা এতদিন মুখ ফুটে কোনো কথা বলতে পারেনি, অর্থাৎ সেই বহুদিনের উপেক্ষিত মূক প্রতিবাদী কণ্ঠ ভাষা পায় এই দ্রৌপদী চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

এই গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে দ্রৌপদী যার নাম দৌপদী মেঝেন। তার বয়স সাতাশ। তার স্বামীর নাম দুলন মাঝি। তাদের নিবাস চেরাখান, থানা বাঁকড়া ঝাড়। মহাশ্বেতা দেবী এই গল্পের মাধ্যমে স্বাধীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে অনেকটাই ফাঁক রয়েছে তার দিকে পাঠকের দৃষ্টি নিবন্ধ করতে চেয়েছেন। গল্পটির শুরু আকস্মিক ভাবে। দ্রৌপদীর নাম, তার বয়স, স্বামীর নাম, নিবাস, থানার নাম ইত্যাদি পরিচয় জ্ঞাপক কথাগুলি ছোট ছোট বাক্যে আছে। তার পরই দুই তকমাধারী যুনিফর্মের মধ্যে সংলাপ। এদের সংলাপে জানা যায় পুলিশের খাতায় অপরাধী হিসাবে তাদের নাম আছে। পুলিশ তাদেরকে ধরার জন্য দিনরাত খুঁজে বেড়াচ্ছে। দুই তকমাধারীর মতে দ্রৌপদী, -

> "মোষ্ট নটোরিয়াস মেয়েছেলে। লং ওয়ানটেড ইন মেনি।"[১]

ওদের কথা অসমাপ্ত হলেও আমরা পাঠকেরা বুঝে নেই দ্রৌপদী মেঝেনকে রাষ্ট্রীয় শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই গল্পে একটা প্রবল প্রতিবাদী চেতনা আছে যা প্রতিরোধে উদ্যত। গল্পটির কথনেও একটি বিশেষত্ব আছে। প্রথম বিবৃতিমূলক বাক্য। তারপরই প্রত্যক্ষ সংলাপ। ড্যাসিয়ের সংলাপ থেকে জানা যায় দুলন ও দ্রৌপদী দাওয়ালী কাজ করত। বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও বাঁকুড়ায় ঘুরে ঘুরে কাজ করত। ১৯৭১ সালে বিখ্যাত অপারেশন বাকুলিতে যখন তিনটি গ্রাম হেভি কর্ডন করে মেশিনগান করা হয় তখন এরা স্বামী স্ত্রী মৃতের ভান করে পড়ে থাকে। ওদেরকে পুলিশ মনে করে 'মেইন ক্রিমিনাল'। সূর্য সাহু ও তার ছেলেকে খুন খরার সময়ে 'অপার কাষ্টে'র ইদারা ও টিউবওয়েল দখল। সব কিছুতেই দ্রৌপদী ও তার স্বামী দুলন মাঝির ভূমিকা প্রধান ছিল। দুলন ও দ্রৌপদী দীর্ঘদিন নিয়ানডারথাল অন্ধকারে নিখোঁজ থাকে। ওরা নিজেদের অসামান্য দক্ষতায় আত্মগোপন করে থাকে। ফলে বিশেষ বাহিনী তাদের অনুসন্ধান করতে ব্যর্থ হয়। যদিও পরে দুলনকে সেনাবাহিনীগুলি করে মারতে সক্ষম হয়। কিন্তু দ্রৌপদীর সন্ধান পাওয়া যায় না। এই গল্পের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় আদিবাসী সাঁওতালদের ভূমিকা, তাদের নিজস্ব প্রতিরোধ, অসাম্য আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের সংগঠিত প্রতিরোধের এক নৈর্ব্যক্তিক বিবরণ দিয়েছেন মহাশ্বেতা দেবী।

রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের অকারণ ভীতি প্রতিবাদী সাঁওতালদের দমন করার জন্য যে প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তারও বিবরণ পাওয়া যায় এই গল্পে। কৌশলে লেখিকা এই গল্পে প্রশাসনের রক্ষক উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মনোভাবকে ফুটিয়ে তোলেন। সকল জমানাতেই সসম্মানে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য এবং সুবিধা ভোগ করার জন্য যা যা দরকার সবই তারা করেন। প্রতিবাদী, সংগঠিত ভূমিহীন অন্যের জমিতে মজুর খাটা আদিবাসী সাঁওতালদের দমন করার জন্য যত ধরনের নিপীড়নের দরকার তার আয়োজন করেন। আবার লেখিকার ভাষায়, -

> "ওদের একজন (থিওরিতে) হয়ে ওদের বোঝেন এবং ভবিষ্যতে এ নিয়ে লেখালেখির বাসনা রাখেন।"[২]

পাঠকদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এগুলি সবই তাদের লোক দেখানো। এই গল্পে কাহিনী কথনে একটি তির্যক ভঙ্গী আছে। সভ্য শিক্ষিত মানুষের কপটতা, দ্বিচারিতা আর ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিতে চেয়েছেন। যদিও মহাশ্বেতা দেবী সবসময় সামাজিক কিংবা ধর্মীয় ভন্ডামির মুখোস উন্মোচনে বিশ্বাসী। দুলন মাঝির পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ার বর্ণনা থেকে তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি।

> "তল্লাস কালে সেনাদের খোঁজিয়াল দুখীরাম ঘড়ারী দেখতে পায় চ্যাটাল পাথরে উপুড় হয়ে শুয়ে এক সাঁওতাল যুবক মুখ ডুবিয়ে জল খাচ্ছে। সেই অবস্থায় তাকে গুলিবিদ্ধ করা হয় ও ৩০৩-র আঘাতে ছিটকে পড়ে যেতে যেতে সে দুহাত ছড়িয়ে ভীষণ গর্জনে 'মাহো' বলে সফেন রক্ত উদ্গিরণ করে নিশ্চল হয়। পরে বোঝা যায় সেই কুখ্যাত দুলন মাঝি।"[৩]

প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার নামে অসহায় দরিদ্র এক আদিবাসী সন্তানের নির্মম মৃত্যু। যা পাঠকদের আহত করে না, হতবাক করে দেয়। আইনের রক্ষকরা ভাবে দুলন মাঝির মৃত্যুতে তারা নিষ্কন্টক হল। কিন্তু এ ভাবা বৃথা কারণ কোন নেতার মৃত্যুতে আন্দোলন শেষ হয় না, বরং তা জোরকদমে এগিয়ে যায়। মৃত্যুর আগে দুলন মাঝি 'মাহো' বলে গর্জন করেছিল। এই শব্দটির মানে জানার জন্য "আদিবাসী বিশেষজ্ঞ দুই মক্কেলকে কোলকাতা থেকে উড়িয়ে আনা

হয় এবং তারা হফম্যান জেফার গোল্ডেন পামার প্রমুখ মহাশয়দের রচিত অভিধান নিয়ে গলদঘর্ম হতে থাকেন।"[৪] শুধু সেনানায়ক, পুলিশ প্রশাসন যন্ত্রের রক্ষকরা নয় বুদ্ধি জীবীর নির্মম ঔদাসীন্য অর্থহীন পান্ডিত্যের প্রদর্শনীকেও মহাশ্বেতা দেবী তীব্রভাবে আঘাত করতে চেয়েছেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। শেষপর্যন্ত জলবাহক সাঁওতাল চমরুকে ডাকা হয়। সে, "ফুচফুচিয়ে হাসে, বিড়ি দিয়ে কান চুলকোয় ও বলে, উটি মালদ'র সাঁওতালরা সেই গাঁধীরাজার সময়ে লড়তে নেমে বলেছিল বটে। উটি লড়াইয়ের ডাক।"[৫]

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র দ্রৌপদী ওরফে দৌপদি মেঝেন। দৌপদি মেঝেনকে পুলিশ ধরতে চায় কারণ তাকে আটকালে সেই অন্যদের ধরিয়ে দেবে। এই রকম ভাবনা হয়তো এই মতলবের পিছনে কাজ করে। শেষ পর্যন্ত তাকে ধরিয়ে দিতে পারলে পুরস্কার দেওয়া হবে এইরকম ঘোষণা দেওয়া হয়। তাই দ্রৌপদী ঠিক করে নেয় সে ধরা দেবে কিন্তু অন্য কেউ যাতে ধরা না পড়ে তার ব্যবস্থা করবে। অশিক্ষিত, দরিদ্র, মজুর দ্রৌপদীরা সংগঠিত হয়েছে। তাদেরকে সংগঠিত করেছে শহর থেকে আগত শিক্ষিত কিছু তরুণ। দ্রৌপদী তাদের মুখ থেকে শুনে শুনে শিখেছে কেমন করে নির্যাতনের সঙ্গে মোকাবিলা করা যায়। দ্রৌপদীর ভাবনায় ঘটে যাওয়া কতকগুলি ঘটনা ছায়া ফেলে। সে ঠিক করে কিছুতেই তাদের কাছে হার মানবে না, মাথা নত করবে না। কারণ –

> "দ্রৌপদীর রক্ত চম্পাভূমির পবিত্র কাল রক্ত। নির্ভেজাল চম্পা থেকে বাকুলি, কত লক্ষ চাঁদের উদয়াস্তের পথ।"[৬]

দ্রৌপদী হেঁটে চলে। দ্রৌপদীর হাঁটা প্রতীকী হয়ে ওঠে মহাশ্বেতা দেবীর বর্ণনায়, -

> "প্রৌঢ় সেনানায়ক দ্রৌপদীকে দেখতে পায়। দ্রৌপদী থমকে দাঁড়ায়। সে দেখে পুলিশের চর রোতোনী সাহুকে, দেখে সোমাই ও বুধনা কে অরিজিতের গলা যেন সে শুনতে পায়, যখন জিতেছ, তা যেমন জানবে, যখন হারলে, তা মানবে এবং পরের স্টেজ থেকে কাজ করবে।"[৭]

দ্রৌপদী ধরা পড়ার আগে ঝাড়খানী জঙ্গলের মানুষগুলিকে সচেতন করে দিতে চায় সর্ব শক্তি দিয়ে কুলকুলি দিয়ে। কারণ তাদের কাছে কুলকুলি হল মানুষকে জাগ্রত করার এক প্রধান অস্ত্র। তাই সে তিনবার কুলকুলি দিয়েছিল। তৃতীয় কুলকুলিতে ঝাড়খানি জঙ্গলের আঁচলের গাছে পাখিগুলো রাতের ঘুম ভেঙে ডানা ঝাপটে ডেকে উঠে। সন্ধ্যা ছটা সাতান্নতে দ্রৌপদী মেঝেন অ্যাপ্রিহেনডেড হয়। দ্রৌপদীকে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। আটটা সাতান্নতে সেনানায়কের ডিনার টাইম হয় এবং "ওকে বানিয়ে নিয়ে এস। ডু দি নীড ফুল।"[৮] এই নির্দেশ দিয়ে তিনি চলে যান। এর পরের কাহিনী কথনে আমরা এমন এক বর্ণনা পাঠ করি যা শুধু মাত্র আমাদেরকে লজ্জাই দেয় না, পুরো মানব সভ্যতাকে ব্যঙ্গ তথা কালিমা লিপ্ত করে। সারা রাত ধরে অত্যাচার করার পর যখন সেনানায়ক দ্রৌপদীকে নিয়ে আসার আদেশ দেন তখন ঘটনাটা ক্লাইমেক্সে পৌঁছে যায়। সেনানায়ক দ্রৌপদীকে কাপড় পরার জন্য বললে সে কাপড় পরে না। উভয় উরু ও যোনীদেশে চাপ চাপ রক্ত নিয়ে সে সোজা ঘট ঘট করে সেনানায়কের দিকে এগিয়ে যায়। বলে, -

> "কাপড় কি হবে, কাপড়? লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু?"[৯]

তারপর চারদিকে চেয়ে দ্রৌপদী সেনানায়কের সাদা শার্টটি বেছে নিয়ে সেখানে থুথু ফেলতে ফেলতে বলে, -

> "হেতা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরাতে দিব না। আর কি করবে? লেঃ কাঁউটার কর, লে কাউটার কর?"[১০]

সেনানায়ক তখন সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে যায়। মহাশ্বেতা দেবীর ভাষায়, -

> "দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।"[১১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 184 - 189
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দ্রৌপদী-র এই প্রতিবাদী চরিত্র আমাদেরকে হতবাক্ ও চমকিত করে দেয়। তাই দেখা যায় যে, দ্রৌপদীকে নগ্ন ও ধর্ষণ করার ভেতর কিছু ব্যক্তি মানুষের শরীরী পাগলা ক্ষুধা-ই চরিতার্থ হয় না সম্পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার নগ্ন চরিত্র ধরা পড়ে যায়। দ্রৌপদীর মতো আমাদের সমাজে অনেক মানুষ রয়েছে যারা প্রশাসক, জমিদার, মহাজনদের কামনা বাসনার স্বীকার। সভ্য সমাজে আইনের রক্ষকদের এমন অসভ্য আচরণ যা স্বাধীন ভারতবর্ষে প্রতিনিয়ত ঘটে যায়। মহাশ্বেতা দেবী 'অগ্নিগর্ভ' গ্রন্থের ভূমিকাতে যা বলেছেন তা এখানে খুবই প্রণিধানযোগ্য, -

> "১৯৬৭-র মে জুনে নকশাল বাড়ি অঞ্চলে সংগঠিত আন্দোলনের প্রেক্ষাপট উপস্থাপনা, বিষয়টি পুনরালোচনার সহায়ক হবে। দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি, খড়ি বাড়িও ফাঁসি দেওয়া অঞ্চলের বেশিরভাগ অধিবাসী হলেন আদিবাসী তথা ভূমিহীন চাষী। তাদের মধ্যে আছে মেদি, লেপচা, ভুটিয়া, সাঁওতাল, ওঁরাও, রাজবংশী এবং গোর্খা সম্প্রদায়ের মানুষ। স্থানীয় জোতদাররা দীর্ঘকালীন 'অধিকার' ব্যবস্থায় তাদের নিজেদের শোষণ অব্যাহত রাখেন। এ ব্যবস্থার নিয়মানুসারে জোতদারেরা, নিভুই চাষীকে বীজধান, লাঙল, বলদ, খাদ্য ও সামান্য পয়সা দিয়ে নিজের খেতে কাজে লাগান। ফসলের সিংহ ভাগ ঘরে তোলেন। এর বিরুদ্ধেই চাষীর ক্ষোভও প্রতিবাদ।"[১২]

তাই দেখা যায় যে, ১৯৭৬ থেকেই নকশালবাড়ী অঞ্চল জ্বলতে শুরু করে। দ্রৌপদীর মতো হাজার হাজার নর নারী অস্ত্র হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। শুরু হয় পুলিশের গুলির সঙ্গে আদিবাসীদের তীরের লড়াই। আপাত দৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় যে, দ্রৌপদীদের আন্দোলন বার্থ হয়েছে। কিন্তু তা ঠিক নয়। সেই আন্দোলন থেকে জন্ম নিয়েছে আরও বৃহত্তর আন্দোলন। এক প্রতীকী ব্যঞ্জনায় শেষ হয় 'দ্রৌপদী' গল্প। যাতে দ্রৌপদীদের জয় ঘোষণা করা হয়েছে। সত্তরের জ্বলন্ত দিনগুলোর কথা 'দ্রৌপদী' গল্পে পাই। তবে এমন ঘটনা সে সময়ের অনেকের গল্পেই পাওয়া যায়। কিন্তু 'দ্রৌপদী'র মতো খুব কম গল্পই সাধারণের পর্যায় ছাড়িয়ে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। এখানেই মহাশ্বেতা দেবীর গল্পের নানা স্তর সমকালের মধ্যে ব্যতিক্রমী হয়ে অন্য কালকে ধরে রাখে।

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর সাহিত্যে বার বার নারীকে তুলে এনেছেন। যে নারী শুধুমাত্র তার মায়ের কোমল সত্তা নিয়ে অবস্থান করে না। যে নারীর কথা আসলে মানুষের অন্তরের কথা, মানবিকতার কথা, মনুষ্যত্ব বোধের অবক্ষয়ের কথা। তাই আমরা অকপটে স্বীকার করতেই পারি যে, মহাশ্বেতা দেবী জীবনের অনেক চরাই উৎরাই ভঙ্গুর পথ অতিক্রম করে যেখানে এসে তার ধারালো লেখনীকে সমাপ্ত করেছেন তা একদিনের পথ নয় অনেক বছরের সাধনা তথা তপস্যার ফসল। তার বলিষ্ঠ লেখনীর ভাষা অমসৃন বাক্যবন্ধ। সাহিত্যের বিষয় নির্বাচনেও যেন নারী লেখিকার সীমিত গন্ডী ছাড়িয়ে গেছে। তাঁর পূর্বসুরী লেখিকাদের জাতি কে ছাড়িয়ে চলে গেছেন অনেক দূরে সেই খোলা আকাশের নীচে খেটে খাওয়া মানুষদের বিশেষভাবে অসহায়, অবলা নারীদের হৃদয় মন্দিরে। এমন কি বলা যায় মৈত্রেয়ী দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, লীলা মজুমদার, আশালতা সিংহ, সুলেখা সান্নাল এবং প্রতিভা বসুর মত বিখ্যাত লেখিকাদের নির্দিষ্ট সমাজ গন্ডী পার হয়ে নারী অবজ্ঞা তথা শোষণের আর এক কদর্য তথা কুৎসিত চেহারাকে সবার সামনে অকপটে তুলে ধরেছেন।

অতি সাধারণ মানুষ সম্পর্কে জানার গভীর উপলব্ধি বা আগ্রহ থেকেই মহাশ্বেতা দেবীর লেখনীতে বিভিন্ন বিষয় স্থান পেয়েছে। সেই মানুষগুলি কে বা কারা? সেই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই বলতে হয় যে মধ্যবিত্ত তথা নিম্নমধ্যবিত্ত খেটে খাওয়া মানুষ, যারা তথাকথিত সভ্য মানুষের ভালাবাসা থেকে বঞ্চিত দরিদ্র কৃষক, কৃষি শ্রমিক, দাস মজুর, মহাজনের বাড়ীতে চিরদিনের জন্য বেগার খাটা শ্রমিক, ঠেলা চালক ইত্যাদি ছিল তাঁর রচনার প্রধান উপাদান। চলতে চলতে নদীর মতোই লেখায় বাঁক নেয়। এই বাঁক থেকেই তিনি প্রবেশ করেন শোষিত, তথা ধর্ষিত নারীর আন্দরমহলে যে নারী শুধু বেঁচে থাকতেই চায় না। সে চায় নারী হয়ে জন্মানোর প্রকৃত যোগ্যতা বা মর্যাদা পাবার অধিকার সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার। এর জন্যই তাঁর লেখনী গর্জে ওঠে, হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। ফলে 'ধৌলী', 'দ্রৌপদী', 'শিকার' ইত্যাদি গল্পগুলি তাঁর সৃষ্টিতে ধরা দেয়। যেখানে নারী এক প্রতীকী ব্যঞ্জনায় পর্যবসিত হয়।

নারীদের অন্তরের গহনে প্রবেশ করে তিনি তাদের মনের কথা সুকৌশলে বের করে আনেন তখন তিনি অনুভব করেন তারা শুধু তাদের অধিকার থেকেই বঞ্চিত নয়, তারা সমাজের হায়েনাদের পাশবিক লোভ লালসার শিকার হয়ে সমাজে বেঁচে থাকে অথবা অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তাই মহাশ্বেতা দেবী নারীদের তিলে তিলে অবলা থেকে সবলা করার ব্রত নিয়ে লেখনী ধারণ করেন। এরপরই আমরা দ্রৌপদী-র মতো প্রতিবাদী চরিত্র পাই। দ্রৌপদী-র প্রতিবাদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিরুপমার মতো নীরব প্রতিবাদ নয়, সরব প্রতিবাদ। আজও সমাজে অনেক দ্রৌপদী ধর্ষিত হয়। মানুষরূপী মুখোশ ধারী হায়েনাদের জঘন্য অত্যাচারের সম্মুখীন হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ন্যায্য বিচার পায় না। বিচারের বাণী নীরবে ক্রন্দন করতে থাকে। মহাশ্বেতা দেবী তার গল্প তথা উপন্যাসের মাধ্যমে দেখিয়েছেন লোক লজ্জার ভয়কে উপেক্ষা করে, এমন কি অত্যাচারীর রক্ত চক্ষুকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নারী সমাজ মাঠে নেমে বেরিয়ে গেলে একদিন না একদিন তারা সফল হবেই। প্রকৃতপক্ষে সবাইকে সচেতন হতে হবে এবং মানসিকতা-র বদল ঘটাতে হবে। তবেই সমাজ থেকে হায়েনার দল নির্মূল হবে।

মহাশ্বেতা দেবী রচিত বিশেষ করে আদিবাসী জীবন ভিত্তিক গল্পগুলি পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, লেখিকা গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে বিভিন্ন গোষ্ঠীর আদিবাসীদের জীবন ও সমস্যার ছবি তুলে ধরেছেন। আদিবাসীদের প্রতি সুদীর্ঘকাল ধরে জোতদার, মহাজন, আমাদের সমাজের রক্ষক তথা পুলিশ প্রশাসনের নানা ধরনের অত্যাচার শোষণ ও পীড়নের যথার্থ পরিচয় দান করে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন আমরা অর্থাৎ তথাকথিত দিকু লোকেরা কিভাবে দিনের পর দিন দীর্ঘকাল ধরে সহজ সরল আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে উপেক্ষা করে এসেছি। তারা যে কি দুর্বিষহ জীবন যাপন করছে সমতলের তথাকথিত সভ্য মানুষরা তার কতটুকুই যা খোঁজ রাখে। শুধু শহরের সভ্যতা, শহরের মানুষকে দেখলে চলবে না। গ্রামে-গঞ্জে, পাহাড়ে-টিলায় বসবাসকারী মানুষদের খবর রাখতে হবে। তাদেরকে সচেতন করতে হবে।

লেখিকার লেখার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তাঁর ক্ষুরধার রচনাভঙ্গী। ঘটে যাওয়া নির্যাতিত জীবনের কাহিনীর মাধ্যমে ব্যঙ্গে বিদ্রূপে ও মমতায় চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তোলেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয় এক কাব্যময়ী আবেষ্টনী। হতদরিদ্র মানুষের কোনরকমে শুধু জীবস্মৃত অবস্থায় বেঁচে থাকার লড়াইকে মহাশ্বেতা দেবী দেখান নি। তিনি দেখান গল্পের পাত্র-পাত্রীরা নিজেরাই এই বিশাল বিশ্বে মানমর্যাদা নিয়ে অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার, মানব সমাজে স্ব-স্ব পরিচয় খুঁজে নেবার লড়াই করে থাকে। মহাশ্বেতা দেবীর একটি প্রাসঙ্গিক বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করতে পারি, -

> "স্বাধীনতার পরেও আমি অন্ন, জল, জমি, ঋণ বেঠবেগারী কোনটা থেকে দেশের মানুষকে মুক্তি পেতে দেখলাম না। যে ব্যবস্থা এই মুক্তি পেতে দিল না, তার বিরুদ্ধে নিরঞ্জন, শুভ্র ও সূর্য সমান ক্রোধই আমার সকল লেখার প্রেরণা।"[১৩]

তাই মহাশ্বেতা দেবী পাঠকের বিনোদনের জন্য বা আকৃষ্ঠ করার জন্য হয়তো বা রোমান্টিক কাহিনী উপহার দেবার জন্য সাহিত্য রচনা করেন নি। তাঁর গল্পের কাহিনী বিন্দুমাত্র পাঠকদের বিনোদনে সাহায্য করে না। কোনো রাজকন্যা বা রাজপুত্রের স্বপ্নের জগতে নিয়ে যায় না। কিন্তু পাঠকদের জটিল কোনো প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। কোথাও না কোথাও, কখনও না কখনও এই সব ঘটনা ঘটেই চলছে। আর তা আমাদের মনে করিয়ে দেয় এই সভ্যতা, এই সমাজ, এত উন্নতি আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছে, সামনের দিকে না পিছনে? তা এখন আমাদের যেন স্বাধীনতার প্রায় আটাত্তর বছর পরেও ভাবতে হচ্ছে। একজন বিখ্যাত সমালোচক মহাশ্বেতা দেবীর রচনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন, -

> "মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে তথাকথিত বঞ্চিত, শোষিত, মানুষজনের প্রসঙ্গ যেমন ঘুরে ফিরে আসে, তেমনই তীক্ষ্ণ শ্লেষে, বিদ্রুপের মোচড়ে উন্মোচিত হয় মানুষের ভিতরের চেহারা। এ যেন নিরন্তর ঘা দিয়ে চলা কোনো এক মুক, দায়বোধহীন, অবিবেকী সমাজ সত্তাকে। প্রতিকার? হয়তো আশা করেন, হয়তো আশাহত হন। তবু এ দায়কে মেনে নিয়েই তাঁর গল্প লেখা, যা গল্প ভালো লাগা পাঠকদের ভ্রূকুঞ্চনেরও হয়তো বা কারণ ঘটায়।"[১৪]

সবশেষে বলব, মহাশ্বেতা দেবী পাঠককে বিনোদনের তৃপ্তি দিতে ব্যর্থ হন কারণ তাঁর গল্পে রয়েছে শুধুই সাড়া জাগানো প্রতিবাদী ভাষা, প্রতিবাদী রং। মানুষেরা জলের অভাবে তৃষ্ণার্ত থাকে, জমির অভাবে খাদ্য পায় না, শস্য ফলাতে পারে না। উচ্চবর্ণের জোতদার, মহাজনদের অত্যাচারে মেয়েরা রেন্ডী হতে বাধ্য হয়। আর এই মূঢ় ম্লান মুখে প্রতিবাদী ভাষা ফুটিয়ে তোলাই তাঁর লেখার প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাই শুধু মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যে নয় সমগ্র বাংলা সাহিত্যে 'দ্রৌপদী' এক অনন্য সাধারণ প্রতিবাদী চরিত্র।

Reference:

১. দেবী মহাশ্বেতা, দ্রৌপদী, মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন চতুর্থ মুদ্রণ- ২০০২, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, পৃ. ২৯
২. তদেব, পৃ. ৩০
৩. তদেব, পৃ. ৩১
৪. তদেব, পৃ. ৩১
৫. তদেব, পৃ. ৩১
৬. তদেব, পৃ. ৩৬
৭. তদেব, পৃ. ৩৭
৮. তদেব, পৃ. ৩৮
৯. তদেব, পৃ. ৩৯
১০. তদেব, পৃ. ৩৯
১১. তদেব, পৃ. ৩৯
১২. দেবী, মহাশ্বেতা, অগ্নিগর্ভ (ভূমিকা) করুণা প্রকাশনী কোলকাতা ৫ম মুদ্রণ, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২
১৩. তদেব পৃ. ৩
১৪. মুখোপাধ্যায়, সোমা, মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলন, (ভূমিকা অংশ) মডেল পাবলিশিং হাউস, প্রকাশ ১৯৯৭, পৃ.১০